أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book# 82) www.motaher21.net

كوٗ نوٗامع الصادقين

"সত্যনিষ্ঠ লোকদের সাথে থাক।"

"Be with those who are true."

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِينَ

হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।

১১৯ নং আয়াতের তাফসীর:

শানে নুযূল:

আব্দুল্লাহ বিন কা'ব বিন মালেক হতে বর্ণিত যিনি কা'ব বিন মালেক (দৃষ্টিহীন হওয়ার পরে) তার পথপ্রদর্শক হিসেবে ছিলেন। তিনি বলেন: আমি কা'ব বিন মালেক (রাঃ)-কে তাবূক যুদ্ধে যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিলেন তাদের ঘটনা বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আল্লাহর কসম! হয়ত আল্লাহ (রাসূলুল্লাহর কাছে) সত্য কথা প্রকাশের কারণে অন্য কাউকে অত বড় পরীক্ষা করেননি যে পরীক্ষা আমাকে করেছেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে তাবূক যুদ্ধে না যাওয়ার সঠিক কারণ বর্ণনা করেছি তখন থেকে আজ পর্যন্ত মিথ্যা বলার ইচ্ছাও করিনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ওপর এ আয়াত নাযিল করেন:

(لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَي النَّبِيِّ .... وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ)

(সহীহ সহীহ বুখারী হা: ৪৬৭৮, সহীহ মুসলিম হা: ২৭৬৯)

তাবুক অভিযানকে سَاعَةِ الْعُسْرَةِ 'সঙ্কটময় মুহূর্ত' বলে অভিহিত করেছেন। কারণ প্রথমতঃ তখন গ্রীষ্মকাল, প্রচুর গরম ছিল। দ্বিতীয়তঃ ফসল কাটার সময় ছিল। তৃতীয়তঃ অনেক দূরের সফর ছিল। চতুর্থতঃ সফরের সম্বল ছিল অতি অল্প। ফলে এ অভিযানে অংশগ্রহণকারীদেরকে جيش العسرة বা সঙ্কটকালের সেনা বলা হয়।

যে সকল সাহাবী সামর্থ থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে তাবুক যুদ্ধে যায়নি এবং নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে তাদের তাওবাহ কবূল করার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে।

(وَعَلَي الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا)

'এবং তিনি ক্ষমা করলেন অপর তিনজনকে' অর্থাৎ অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ঐ তিনজনের তাওবাহ কবূল করেছেন যেভাবে অন্যান্যদের তাওবাহ কবূল করত ক্ষমা করেছেন যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধে মুসলিমদের সাথে বের হয়নি। সে তিনজন হলেন: কাব বিন মালিক, মুরারা বিন রাবী ও হিলাল বিন উমাইয়া (রাঃ)। (তাফসীর সা'দী, পৃঃ ৩৬৫)

خُلِّفُوْا ও مُرْجَوْنَ

এর অর্থ একই। অর্থাৎ যাদের তাওবাহ কবুল করা বা না করা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল, অতঃপর পঞ্চাশ দিন পর তাদের তাওবাহ কবূল করা হয়েছিল। সহীহ বুখারীর ৪৪১৮ নং হাদীসে এ সম্পর্কে বিস্তারীত বর্ণনা এসেছে।

(وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ)

'এবং সত্যবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হও'অর্থাৎ সত্য বল, সত্যকে আঁকড়ে ধর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো। তাহলে ধ্বংস থেকে নাজাত পাবে এবং সকল কাজে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য প্রশস্ততা দেবেন ও নিষ্কৃতির পথ বের করে দেবেন। যেমন তিনজন সাহাবী সামর্থ থাকা সত্ত্বেও তাবুক যুদ্ধে যায়নি, পরে সত্য কথা বলার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদের তাওবাহ কবুল করে নিষ্কৃতির পথ বের করে দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন: তোমাদের সত্য বলা আবশ্যক। কেননা সত্য সৎকাজের দিকে দিক নির্দেশনা দেয় আর সৎ কাজ জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন ব্যক্তি যখন সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য অনুসন্ধান করে তখন তার নাম (সত্যবাদী) সিদ্দিকীনদের সাথে লিখা হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৬০৯৪)

তাই আমরা সদা সত্য বলব এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকব তাহলে আল্লাহ তা'আলা সকল কাজে আমাদের সহায় হবেন।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে জিহাদ থেকে বিরত থাকায় যে ত্রুটি কতিপয় নিষ্ঠাবান সাহাবীর দ্বারাও হয়ে গেল এবং পরে তাঁদের তাওবাহ কবুল হলো, এ ছিল তাঁদের তাকওয়ারই ফলশ্রুতি। তাই এ আয়াতের মাধ্যমে সমস্ত মুসলিমকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর "তোমরা সবাই সত্যবাদীদের সাথে থাক" বাক্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সত্যবাদীদের সাহচর্য এবং তাদের অনুরূপ আমলের মাধ্যমেই তাকওয়া লাভ হয়। আর এভাবেই কেউ ধ্বংস থেকে মুক্তি পেতে পারে। প্রতিটি বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারে। [ইবন কাসীর]

হাদীসেও সত্যবাদিতার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর; কেননা সত্যবাদিতা সৎকাজের দিকে নিয়ে যায়, আর সৎকাজ জান্নাতের পথনির্দেশ করে। মানুষ সত্য বলতে থাকে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করতে থাকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর দরবারে তাকে সত্যবাদী হিসেবে লিখা হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক; কেননা মিথ্যা পাপের পথ দেখায়, আর পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, আর একজন মানুষ মিথ্যা বলতে থাকে এবং মিথ্যা বলার চেষ্টায় থাকে শেষ পর্যন্ত তাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখা হয়।" [বুখারী ৬০৯৪; মুসলিমঃ ২৬০৭]

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবাদের ফযীলত জানতে পারলাম।

২. মু'মিনদের ওপর আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ যে, তিনি তাদের অন্তরকে বক্রতা থেকে মুক্ত করে রেখেছেন।

৩. কা'ব বিন মালিকসহ তাঁর দুই সাথীর ফযীলত জানলাম।

৪. কথায় ও কাজে তাক্বওয়া ও সত্যবাদীতার ফযীলত জানলাম।

সুরা: আত-তওবা

আয়াত নং :-৩৮

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ۗ اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হলো, যখনই তোমাদের আল্লাহর পথে বের হতে বলা হলো, অমনি তোমরা মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে? তোমরা কি আখেরাতের মোকাবিলায় দুনিয়ার জীবন পছন্দ করে নিয়েছো? যদি তাই হয় তাহলে তোমরা মনে রেখো, দুনিয়ার জীবনের এমন সাজ সরঞ্জাম আখেরাতে খুব সামান্য বলে প্রমাণিত হবে।

৩৮ নং আয়াতের তাফসীর:

অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য, নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়া প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। সেজন্য আয়াতে বলা হয়ঃ “হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে?" হাদীসে এসেছে, "বৃদ্ধ মানুষের মনও দুটি ব্যাপারে যুবক থেকে যায়, একটি হচ্ছে দুনিয়াপ্রতি অপরটি বেশী বেশী আশা-আকাঙ্খা" [বুখারী ৬৪২০]

রোগ নির্ণয়ের পর তার প্রতিকার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য। হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মধ্যে ডুবায়, সুতরাং সে দেখুক, সে আঙ্গুল কি নিয়ে আসে। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শাহাদাত আঙ্গুলীর দিকে ইঙ্গিত করলেন। [মুসলিম: ২৮৫৮]

অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার কোন এক উচু স্থান দিয়ে বাজারে প্রবেশ করলেন। বাজার লোকে লোকারণ্য তিনি একটি কানকাটা মরা ছাগলের পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি সেটির কানের বাকী অংশে ধরলেন। তারপর বললেন, কে এটিকে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে রাজী আছ? লোকরা বলল, আমরা কেউ এটিকে কোন কিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করব না। আর আমরা এটাকে নিয়ে কি করব? তিনি বললেন, তোমরা কি চাও যে এটা তোমাদের হোক? তারা বলল, যদি জীবিতও থাকত তারপরও সেটা দোষযুক্ত ছিল; কেননা তার কান নেই। তদুপরি সেটা মৃত। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ করে বলছি দুনিয়া আল্লাহর কাছে এর চেয়েও বেশী মূল্যহীন। [মুসলিম: ২৯৫৭]

সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা- ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তাই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের সার্থক উপায়।

এর দুটো অর্থ হতে পারে।

এক, আখেরাতের অনন্ত জীবন ও সেখানকার সীমা-সংখ্যাহীন সাজ সরঞ্জাম দেখার পর তোমরা জানতে পারবে, দুনিয়ার সামান্য জীবনকালে সুখঐশ্বর্য ভোগের যে বড় বড় সম্ভাবনা তোমাদের করায়ত্ত ছিল এবং যে সর্বাধিক পরিমাণে বিলাস সামগ্রী তোমরা লাভ করতে পেরেছিলে তা আখেরাতের সেই সীমাহীন সম্ভাবনা এবং সেই অন্তহীন নিয়ামতে পরিপূর্ণ সুবিশাল রাজ্যের তুলনায় কিছুই নয়। তখন তোমরা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টি ও অদূরদর্শিতার জন্য এ মর্মে আফসোস করতে থাকবে, যে, আমরা হাজার বুঝানো সত্বেও দুনিয়ার তুচ্ছ ও ক্ষণস্থায়ী লাভের মোহে তোমরা কেন নিজেদেরকে এ চিরন্তন ও বিপুল পরিমাণ লাভ থেকে বঞ্চিত রাখলে।

দুই, দুনিয়ার জীবনের সামগ্রী আখেরাতে কোন কাজে লাগবে না। এখানে যতই ঐশ্বর্য সম্পদ ও সাজ-সরঞ্জাম তোমরা সংগ্রহ করো না কেন, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার সাথে সাথেই সব কিছু থেকে হাত গুটিয়ে নিতে হবে। মৃত্যুর পরপারে যে জগত রয়েছে এখানকার কোন জিনিসই সেখানে তোমাদের সাথে স্থানান্তরিত হবে না। এখানকার জিনিসের যে অংশটুকু তোমরা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবানী করেছো এবং যে জিনিসকে ভালবাসার ওপর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দিয়েছো একমাত্র সেই অংশই তোমরা সেখানে পেতে পারো।

আল্লাহ তা'আলার পথে জিহাদ বর্জন করে দুনিয়া ও তার সাচ্ছন্দ্য এবং আরাম-আয়েশে মগ্ন থাকাকে আল্লাহ তা'আলা নিন্দা করে মু'মিনদেরকে বলছেন যে, তোমরা আখিরাতের চেয়ে পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দকে প্রাধান্য দিচ্ছ? জেনে রেখ! পাথির্ব সুখ সাচ্ছন্দ অতি সামান্য। যদি জিহাদে বের না হও তাহলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেব এবং এমন এক জাতিকে তোমাদের পরিবর্তে নিয়ে আসব যাদের তোমরা কোন ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হবে না, তাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শাস্তি দেবেন, যতক্ষণ তোমরা জিহাদ না করবে ততক্ষণ এ জাতি দ্বারা লাঞ্ছিত হবে।

(ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ)

‘দু’জনের একজন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল’ এখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ) এর মক্কা থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরতকালীন ‘গারে সূর’ পর্বতে অবস্থান ও তখনকার পরিস্থিতির কথা তুলে ধরা হচ্ছে। শত্রুরা খুঁজতে খুঁজতে যে গর্তে নাবী (সাঃ) ও আবূ বাকর (রাঃ) লুকিয়ে ছিলেন সেখানে চলে এসেছে, এমন কঠিন মুহূর্তেও আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবূ বাকর (রাঃ)-কে বললেন: তুমি চিন্তা করো না, আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সাথে আছেন। আবূ বাকর (রাঃ) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে গারে সূর থেকে মুশরিকদের (পায়ের) চিহ্ন দেখাচ্ছিলাম। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! যদি তাদের কেউ পা তুলে তাহলেই আমাদেরকে দেখতে পাবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: যাদের তিনজনের একজন আল্লাহ তা‘আলা তাদের দুজন সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? (সহীহ বুখারী হা: ৪৬৬৩)

(كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى)

‘এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করলেন’ কাফিরদের বাক্য বলতে শির্ক আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী বলতে তাওহীদ।

যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল: একজন বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য যুদ্ধ করে, একজন স্বগোত্রের অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করার জন্য যুদ্ধ করে আর অন্যজন লোক দেখানোর জন্য যুদ্ধ করে- এদের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় যুদ্ধ কার হয়? তিনি বললেন: যে আল্লাহ তা‘আলার কালিমাকে সুউচ্চ করার জন্য যুদ্ধ করে তার যুদ্ধ আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় হয়। (সহীহ বুখারী হা: ১২৩)

সুতরাং মুসলিম নেতা যদি সাধারণভাবে জিহাদের জন্য আহ্বান করে তাহলে সব কিছু বর্জন করে জিহাদে বের হওয়া আবশ্যক। কেউ জিহাদ না করলে আল্লাহ তা‘আলার কোন ক্ষতি হবে না বরং নিজেদের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনবে ।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. ইমাম যখন যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানাবে তখন যুদ্ধ করা আবশ্যক।

২. পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে জিহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ তা‘আলা কঠিন শাস্তি দেবেন।

৩. দীনের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাহায্য করা ওয়াজিব।

৪. আবূ বকর (রাঃ)-এর মর্যাদা জানতে পারলাম।

৫. ইসলাম সর্বদা বিজয়ী থাকে তার ওপর কোন কিছু বিজয় লাভ করতে পারে না।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা কোন বাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে আর আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার।

৪৫ নং আয়াতের তাফসীরঃ

[১] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক যুদ্ধে তিনি এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা বলেনঃ এক যুদ্ধে রাসূল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য্য পশ্চিমাকাশে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন, তারপর ভাষণ দিতে দাঁড়ালেন এবং বললেনঃ হে মানুষগণ! তোমরা শত্রুর সাথে সাক্ষাতের আকাংখায় থেকো না। আল্লাহর কাছে এর থেকে বিমুক্তি চাও। তারপরও যদি সাক্ষাত হয়ে যায় তখন ধৈর্যের সাথে টিকে থাক এবং মনে রেখ যে, তরবারীর ছায়ার নীচে জান্নাত। [বুখারীঃ ২৯৬৫, ২৯৬৬]

[২] এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য এক বিশেষ হেদায়াত দান করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম হচ্ছে, দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় হচ্ছে, আল্লাহর যিকর। আল্লাহর যিকর-এ নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে, তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। সুতরাং দৃঢ়পদ থাকা ও আল্লাহর যিকর এ দু'টি বিজয়ের প্রধান কারণ। [সা'দী; আইসারুত তাফাসীর]

فَتَفْشَلُوْا অর্থাৎ তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে। رِيْحُكُمْ তোমাদের শক্তি।

(نَكَصَ عَلٰي عَقِبَيْهِ)

'সে পিছনে সরে পড়লো' অর্থাৎ পলায়ন করে পিছনের দিকে চলে গেছে।

الْمُنٰفِقُوْنَ মুনাফিক বলা হয় যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে কুফরী গোপন করে।

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে রণকৌশল শিক্ষা দিচ্ছেন। যখন শত্রুদের মুখোমুখী হয়ে যাবে তখন:

১. দৃঢ়পদ ও অবিচল থাকবে। কারণ এ ছাড়া যুদ্ধের ময়দানে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

২. যুদ্ধের ময়দানে বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে। আল্লাহ তা'আলার কাছে সাহায্য চাইবে। সংখ্যাধিক্যের অহঙ্কার করবে না।

৩. আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য করবে। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আনুগত্য করার ক্ষেত্রে কোন মতানৈক্য ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না, হলে তোমাদের শক্তি সাহস বিলুপ্ত হয়ে যাবে। এর জ্বলন্ত প্রমাণ উহুদের যুদ্ধ।

উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)-এর নেতৃত্বে সত্তর জন তিরন্দাজকে পাহাড়ের পাদদেশে নিযুক্ত করে কঠোরভাবে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন কোনক্রমেই যেন এ স্থান ত্যাগ না করে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নির্দেশ ভঙ্গ করলে তারা পরাজয়ের গ্লানিতে নিমজ্জিত হয়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে জিহাদের মাঠেও ইখলাসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, তাদের মত হয়ো না যারা হককে মিটিয়ে দেয়ার জন্য, মানুষকে দেখানোর জন্য এবং আল্লাহ তা'আলার পথে মানুষকে বাধা দেয়ার জন্য যুদ্ধে বের হয়।

অর্থাৎ মক্কার মুশরিকরা বদরের দিন এরূপ উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছিল ফলে তাদের পরিণতি ভাল হয়নি।

(وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ)

'আমি তোমাদের পার্শ্বেই থাকব।' অর্থাৎ বদরের যুদ্ধের জন্য যখন মক্কার কাফিররা রওনা হল তখন বনু বকরের সাথে তাদের যে শত্রুতা ছিল তার কথা মনে পড়ে গেল। তাদের আশঙ্কা ছিল পিছন দিক থেকে বনু বকর তাদের ওপর হামলা করতে পারে। এমন সময় শয়তান বনু বকরের সরদার সূরাকা বিন মালিকের

রূপ ধারণ করে তাদের কাছে আগমন করে বলে: আমি তোমাদের প্রতিবেশি হিসেবে আছি। অতএব তোমাদের কোন শঙ্কা নেই। (আর-রাহীকুল মাখতুম, বদর যুদ্ধ অংশ)

কিন্তু যখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল তখন সে শয়তান পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে আর বলে তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তোমরা যা দেখতে পাও না আমি তো তা দেখি। নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি।

(إِذْ يَقُوْلُ الْمُنَافِقُوْنَ)

'স্মরণ কর যখন, মুনাফিক ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন: উভয় বাহিনী যখন কাতার বন্দী হয়ে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদেরকে মুশরিকদের চোখে কম দেখান। তখন মুশরিকরা মুসলিমদের বিদ্রƒপ করে এ কথা বলে। তাদের ধারণা মুসলিমরা অচিরেই পরাজয় বরণ করবে। এ ব্যাপারে তারা কোন সন্দেহ করত না। (তাফসীর ইবনে কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর)

সুতরাং একজন মু'মিন জিহাদের মাঠেও আল্লাহ তা'আলাকে স্বরণ করবে এবং ইখলাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কোনক্রমেই সংখ্যাধিক্যের বড়াই করবে না এবং মানুষকে দেখানোর জন্য জিহাদ করবে না।

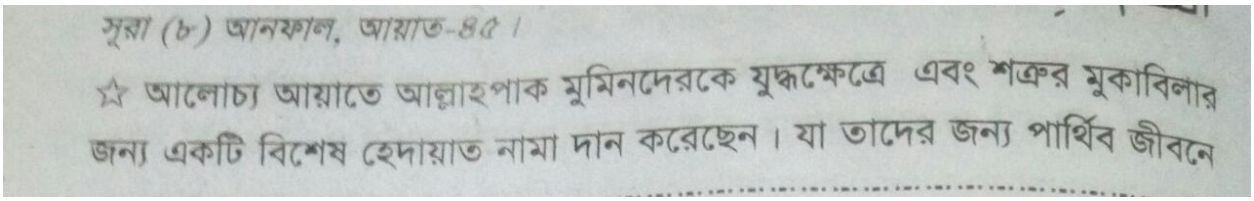
সূরা (৮) আনফাল, আয়াত-৪৫।

☆ আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক মুমিনদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শত্রুর মুকাবিলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়াত নামা দান করেছেন। যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনে

কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্য এতেই নিহিত ছিল।

প্রথমত দৃঢ়তা অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা, স্থির ও অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা এবং সংকল্পের অটলতা উভয়টি এর অন্তর্ভূক্ত। যুদ্ধ ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে কার্যকর অস্ত্র হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায় উপকরণই বেকার।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহর যিকির ঃ এটা সেই বিশেষ হাতিয়ার যার অধিকারী একমাত্র মুমিনেরা। ইতিহাস সাক্ষী এই অস্ত্রের মুকাবিলা বিরোধীরা কখনো কোথাও সফলভাবে করতে পারেনি। আল্লাহর যিকিরে নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ আছে তাতো যথাস্থানে আছেই তদুপরি এটাও বাস্তব সত্য যে দৃঢ়তার জন্য এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক শক্তি যা একজন দূর্বলতম মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মুকাবিলা করতে উদ্বুদ্ধ করে। বিপদ যত কঠিনই হোকনা কেন আল্লাহর স্মরণ সে সমস্তকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন - মানষকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে।

কুরআন করীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুমিনকে আল্লাহর স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকিদসহ।

এখানে এবিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, সমগ্র কুরআনে আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহর যিকির তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম, এবং নাইবা অন্য কোন কাজের কোনরকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহর যিকিরের জন্য কোন শর্তা-শর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা অযু কিংবা পবিত্রতা, পোষাক আষাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় অযুর সাথে, বিনা অযুতে, দাড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে।

ইমাম জাযারী তার হিসনে হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর যিকির শুধু মুখে কিংবা মনে মনে করাকেই বলা হয়না রবং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ এবং রাসূল (সঃ) এর অনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে তাও

জিকরুল্লাহর অন্তর্ভূক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণ স্মরণ করার নির্দেশটিকে যদিও বাহ্যিকভাবে মুজাহেদিনদের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেয়া হল বলে মনে হয় যা স্বভাবতই কষ্ট ও পরিশ্রম সাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর যিকিরের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে তাতে কখনো কোন পরিশ্রম তো হয়ইনা বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজকর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া এমনিতেও কষ্টকর পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গাণের কলি কাজের ফাঁকে গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকে। সুতরাং কুরআনে করীম মুসলমানদেরকে তার একটা উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা এবং তাৎপর্য মন্ডিত।

পরবর্তী দুটি বাক্যে যুদ্ধে সাফল্যের জন্য অন্যান্য শর্তাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- (১) আল্লাহ ও রাসূল (সঃ) এর নির্দেশ মান্য করা। (২) পরস্পর বিবাদে লিপ্ত না হওয়া (৩) ধৈর্য ধারণ করা এবং (৪) অহংকার না করা ইত্যাদি।

অতএব আমাদের উচিত যুদ্ধ কিংবা শান্তি সর্বাবস্থায় শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে আল্লাহর জিকির করা।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যুদ্ধে বিজয়ী হবার অন্যতম কৌশল হল সর্বদা আল্লাহ তা'আলার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে দৃঢ়পদে অবস্থান করা।

২. সর্বদা এমন কি যুদ্ধের ময়দানেও আল্লাহ তা'আলাকে বেশি বেশি করে স্মরণ করা উচিত।

৩. আল্লাহ তা'আলা ও রাসূলের আনুগত্যে সফলতা বিদ্যমান।

৪. মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা ও অহঙ্কার করা হারাম।

৫. শয়তানের ওয়াদা মিথ্যা।

৬. মুনাফিকরা মু'মিনদের ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা রাখে।

৭. মু'মিনদের মাঝে পরস্পর বিবাদ হলে ঐক্য বিনষ্ট হয়।